بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ এপ্রিল, ২০২০ মোতাবেক ১৭ শাহাদাত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ বদরী সাহাবীদের মধ্য হতে আমি হযরত মুআয বিন হারেস (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করব। হযরত মুআয (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু মালেক বিন নাজ্জারের সদস্য ছিলেন। হযরত মুআয (রা.)-এর পিতার নাম ছিল হারেস বিন রিফাআ এবং মায়ের নাম ছিল আফরা বিনতে উবায়েদ। হযরত মুয়াওয়েয এবং হযরত অওফ তার ভাই ছিলেন। এই তিন ভাইয়ের সবাই নিজ পিতার পাশাপাশি মায়ের নামেও পরিচিত ছিলেন আর এদের তিনজনকে বনু আফরাও বলা হতো। হযরত মুআয এবং তাঁর ভাই হযরত অওফ ও হযরত মুয়াওয়েয বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত অওফ এবং হযরত মুয়াওয়েয উভয়েই বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু হযরত মুআয (রা.) পরবর্তী সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত মুআয বিন হারেস এবং হযরত রাফে বিন মালিক জুরখী (রা.) সেই প্রাথমিক আনসারদের অন্যতম যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি মক্কায় ঈমান আনয়ন করেছিলেন। হযরত মুআয সেই আট আনসার সদস্যের একজন ছিলেন যারা আকাবার প্রথম বয়আতে মহানবী (সা.)-এর প্রতি মক্কায় ঈমান আনয়ন করেছিলেন। একইভাবে হযরত মুআয (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও উপস্থিত ছিলেন। হযরত মা'মার বিন হারেস যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) তার এবং হযরত মুআয বিন হারেসের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন।

আবু জাহলের হত্যার বিস্তারিত বিবরণ যদিও বিগত বছরের খুতবায় তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু এখানেও বর্ণনা করা আবশ্যক তাই বর্ণনা করছি। এখানে হযরত মুআয (রা.)-এর সাথে উক্ত ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো বুখারীর রেওয়ায়েত যা আমি উপস্থাপন করব। এই রেওয়ায়েতের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা সম্ভব নয়, বুখারীর পূর্ণ রেওয়ায়েতই পড়তে হবে।

সালেহ বিন ইব্রাহীম তার দাদা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বদরের যুদ্ধে সারিতে দণ্ডায়মান ছিলাম। আমি আমার ডানে ও বামে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, দু'পাশে স্বল্প বয়সী দুই আনাসারী বালক দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাসনা হয় যে, হায়! আমি যদি এমন দু'যোদ্ধার মাঝে থাকতাম যারা এদের চেয়ে বেশি বয়স্ক ও অধিক বলিষ্ঠ হতো! ইত্যবসরে তাদের একজন আমার হাত চেপে জিজ্ঞেস করে যে, চাচা! আপনি কি আবু জাহলকে চেনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ ভাতিজা! তা জেনে তোমার কী কাজ? সে বলে, আমাকে বলা হয়েছে, সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গালি-গালাজ করে। আর সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি তাকে একবার দেখতে পাই তাহলে আমাদের দুজনের মধ্যে যার মৃত্যু প্রথমে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত আমার চোখ তার চোখ থেকে সরবে না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, আমি একথা শুনে খুবই আশ্চার্যান্বিত হই। এরপর অপরজন আমার হাত চেপে একইভাবে প্রশ্ন

করে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আমি আবু জাহলকে দেখলাম সে তার লোকদেরকে প্রদক্ষিণ করছে। আমি বললাম, দেখ! ঐ হলো তোমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে। একথা শোনামাত্রই তারা দু'জন ক্ষিপ্রতার সাথে নিজ নিজ তরবারি নিয়ে তার দিকে ছুটে যায় এবং আঘাত করতে করতে তাকে প্রাণে মেরে ফেলে। এরপর তারা ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মাঝ থেকে কে তাকে হত্যা করেছে? উভয়ে বলে, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছ? তারা বলে, না। তিনি (সা.) তরবারি দু'টি দেখে বলেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। এরপর বলেন, তার সম্পদ মুআয বিন আমর বিন জমুহ (রা.) পাবে আর তাদের উভয়ের নাম ছিল মুআয অর্থাৎ মুআয বিন আফরা (রা.) এবং মুআয বিন আমর বিন জমুহ (রা.)। এটি সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেন, আবু জাহলের পরিনতি কী হয়েছে– তা কে দেখতে যাবে? হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) যান এবং গিয়ে দেখেন যে, তাকে আফরার দুই পুত্র হযরত মুআয এবং হযরত মুয়াওয়েয (রা.) তরবারি দ্বারা এত বেশি আঘাত করেছে যে, সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আবু জাহল? হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি আবু জাহলের দাড়ি ধরি। তখন আবু জাহল বলে, আমার চেয়ে বড় কোন ব্যক্তিকে কি তোমরা হত্যা করেছ? অথবা সে বলে, তার চেয়ে মহান কোন ব্যক্তি আছে কি যাকে তার জাতি হত্যা করেছে? আহমদ বিন ইউনুস তার রেওয়ায়েতে বলেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) তাকে এভাবে বলেছেন যে, তুমিই কি আবু জাহল? এটিও বুখারীর হাদীস।

হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বুখারীর এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন, কতক রেওয়ায়েত অনুসারে আফরার দুই পুত্র মুয়াওয়েয (রা.) এবং মুআয (রা.) মিলে আবু জাহলকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। এরপর তার মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)। বুখারী কিতাবুল মাগাযীতে উক্ত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন যে, সম্ভবত মুআয বিন আমর (রা.) এবং মুআয বিন আফরা (রা.)'র পর মুয়াওয়েয বিন আফরা (রা.)'ও তার ওপর আঘাত হেনে থাকবেন।

বদরের যুদ্ধে আবু জাহলের হত্যায় কে কে অংশগ্রহণ করেছিল– এ বিষয়ে এক জায়গায় এভাবে বিস্তারিত জানা যায় অর্থাৎ ইবনে হিশাম আল্লামা ইবনে ইসহাকের পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) আবু জাহলের পা কেটে দেন যার ফলে সে পড়ে যায় আর ইকরামা বিন আবু জাহল হযরত মুআযের হাতে তরবারির আঘাত হানে, যার ফলে তার হাত বা বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর মুয়াওয়েয বিন আফরা (রা.) আবু জাহলের ওপর আক্রমণ করেন যার ফলে সে ভূপাতিত হয়। কিন্তু তার মাঝে তখনও প্রাণের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) তার মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। মহানবী (সা.) যখন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-কে নিহতদের মাঝে আবু জাহলকে সন্ধান করার নির্দেশ দেন তখন তিনি তার মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। সহীহ মুসলিমের হাদীস অনুযায়ী আফরার দুই পুত্র আবু জাহলের ওপর আক্রমণ করেছিলেন আর সেই হামলার ফলে সে প্রাণ হারায়। একইভাবে বুখারীতে আবু

জাহলের হত্যার পরিচ্ছদেও এমনটিই উল্লেখ রয়েছে। ইমাম কুরতুবীর মতে এটি ভুল ধারণা যে, আফরার দুই পুত্রই আবু জাহলকে হত্যা করেছিল। তিনি বলেন, কতক বর্ণনাকারীর কাছে মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.)-এর পরিচিতির বিষয়টি অস্পষ্ট অর্থাৎ মুআয বিন আফরা (রা.) নয় বরং তিনি ছিলেন মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.), যাকে লোকেরা মুআয বিন আফরা (রা.) ধরে নিয়েছে। তিনি বলেন, মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) মুআয বিন আফরা (রা.)-এর সাথে গুলিয়ে গেছেন। আল্লামা ইবনুল জওযী বলেন, মুআয বিন জমুহ্ (রা.) আফরার সন্তানদের কেউ নন আর মুআয বিন আফরা (রা.) আবু জাহলকে হত্যাকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সম্ভবত মুআয বিন আফরা (রা.)-এর কোন ভাই অথবা চাচা সেসময় উপস্থিত ছিলেন অথবা রেওয়ায়েতে আফরার এক পুত্রের উল্লেখ হয়েছে আর রাবী ভুলে দুই ছেলের উল্লেখ করেছেন। যাহোক, আবু উমর বলেন, এই হাদীসের চেয়ে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর হাদীস অধিকতর সঠিক যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনে আফরা আবু জাহলকে হত্যা করেছিলেন, অর্থাৎ আফরা-এর এক পুত্র ছিল। ইবনে তীন বলেন, হতে পারে, দুই মুআয অর্থাৎ মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ আর মুআয বিন আফরা' মায়ের দিক থেকে ভাই ছিলেন অথবা তারা দুজন দুধভাই ছিলেন। আল্লামা দাউদীর মতে আফরার দুই পুত্র বলতে সাহল ও সোহেলকে বুঝায়। আর বলা হয়, এরা দুজনই হলো, মুয়াওয়েয ও মুআয।

যাহোক, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তিন জন হত্যা করেছে আর কোন কোনটিতে রয়েছে দুই জন; আর এতে মুআয বিন হারেসেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত সাহবেযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বদরের যুদ্ধের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তাতে আবু জাহলকে হত্যার ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

রণক্ষেত্রে অবিরাম হত্যা ও রক্তপাত ঘটছিল। মুসলমানদের সামনে তাদের তিন গুণ বড় সৈন্যদল ছিল, যারা সকল প্রকার সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। পক্ষান্তরে নিরীহ মুসলমানরা সংখ্যায় কম, সাজ-সরঞ্জাম স্বল্প, দারিদ্র্য ও দেশবিতাড়িত হওয়ার দুঃখে জর্জরিত আর বাহ্যিক উপায় উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কাবাসীদের সামনে মাত্র কয়েক মিনিটের শিকার ছিল। কিন্তু এক খোদা ও রসূলের ভালোবাসা তাদেরকে পাগলপারা বানিয়ে রেখেছিল। জীবন্ত ঈমান, যা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কোন জিনিস নেই, তাদের মাঝে এক অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করে রেখেছিল। তারা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মসেবার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছিলেন যার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতামূলকভাবে খোদার পথে জীবন উৎসর্গের জন্য উদগ্রীব ছিল। হামযা (রা.), আলী (রা.) এবং যুবায়ের (রা.) শত্রুদের সারিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। আনসারদের নিষ্ঠার আতিসহ্য এমন ছিল যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আমি আমার ডানে ও বামে তাকিয়ে দেখি আনসারদের দুই অল্পবয়সী যুবক আমার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে দেখে আমার মনোবল কিছুটা কমে যায়, কেননা এ ধরনের যুদ্ধে ডানবামের সাথির ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। আর সেই ব্যক্তিই ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারে যার দুই পার্শ্ব নিরাপদ থাকে। কিন্তু আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, আমি এ চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, এরই মধ্যে উক্ত ছেলেদের একজন চুপিসারে আমাকে জিজ্ঞেস করে, চাচা! সেই আবু জাহল কোথায় যে মক্কায় মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত? খোদার সাথে আমি এ অঙ্গীকার করেছি যে,

আমি তাকে হত্যা করব বা তাকে হত্যাচেষ্টায় নিজেই নিহত হব– মনে হচ্ছিল সে বিপরীত পাশে থাকা অপরজন থেকে এ কথা গোপন রাখতে চাচ্ছে। আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, তাকে উত্তর দেয়ার পূর্বেই অপর দিক থেকে অপরজনও চুপিসারে আমাকে একই প্রশ্ন করে। আমি তাদের সৎসাহস দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। কেননা আবু জাহল ছিল সেনাপতিতুল্য আর তার চতুর্দিকে অভিজ্ঞ যোদ্ধারা সমবেত ছিল। আমি হাতের ইশারায় বলি যে, ঐ হলো আবু জাহল। আব্দুর রহমান বলেন, আমি এই ইশারা করতেই সেই দু'যুবক বাজপাখির ন্যায় ঝাপিয়ে শত্রুসারি বিদীর্ণ করে চোখের পলকে সেখানে পৌঁছে যায় আর এত তড়িৎগতিতে আক্রমণ করে যে, আবু জাহল ও তার সাথিরা সম্বিত হারিয়ে বসে। আবু জাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ইকরামা বিন আবু জাহলও তার পিতার সাথেই ছিল। সে তার পিতাকে বাঁচাতে না পারলেও পিছন থেকে মুআযের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করে যে, তার বাম হাত দেহবিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে থাকে। মুআয ইকরামাকে ধাওয়া করেন কিন্তু সে নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করে। যেহেতু কাটা হাত নিয়ে যুদ্ধ করতে সমস্যা হচ্ছিল তাই হযরত মুআয সেটিকে সজোরে টান দিয়ে নিজের দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেন আর পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, আবু জাহল, যার জন্মের পর কয়েক সপ্তাহব্যাপী উট জবাই করে মানুষের মাঝে মাংস বিলি করা হয়েছিল, তার জন্মে ঢোলের আওয়াজে মক্কার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এমনভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে আর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তার জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ উদযাপন করা হয় যে, মক্কার আকাশ-বাতাসও গুঞ্জরিত হয়। তিনি (রা.) আরো লিখেন, আর বদরের যুদ্ধে সে যখন মারা যায় তখন পনের বছরের স্বল্পবয়স্ক দুই আনসারী বালকের আঘাতের ফলে সে মারা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, যুদ্ধের পর সবাই যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন আমি আহতদের দেখতে যুদ্ধের ময়দানে যাই। তিনি (রা.)-ও মক্কার অধিবাসী ছিলেন, যে কারণে আবু জাহল তাকে ভালোভাবে চিনত। তিনি (রা.) বলেন, আমি যুদ্ধের ময়দানে ঘুরছিলাম। সহসা দেখি, আবু জাহল আহত অবস্থায় কাতরাচ্ছে। আমি যখন তার কাছে যাই তখন সে আমাকে বলে, আমি বাঁচবো বলে মনে হচ্ছে না। ব্যথা অনেক বেড়ে গেছে। তুমিও যেহেতু মক্কার অধিবাসী তাই আমার ইচ্ছা হলো, তুমি আমাকে হত্যা কর যাতে আমার কষ্ট দূর হয়। কিন্তু তুমি জান যে, আমি আরবের নেতা। আর আরবের রীতি হলো, নেতাদের ঘাড় লম্বা রেখে কাটা হয় এবং এটি প্রমাণ বহন করে যে, নিহত ব্যক্তি নেতা ছিল। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার ঘাড় লম্বা করে কাটবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি তার ঘাড় চিবুকের একেবারে নীচ থেকে কাটলাম এবং বললাম, তোমার এই শেষ আক্ষেপটুকুও পূর্ণ করা হবে না। পরিণতি দেখলে বুঝা যায় যে, আবু জাহল, যার গর্দান জীবিতাবস্থায় সর্বদা উঁচু থাকতো, তার মৃত্যু কত লাঞ্ছনাজনক ছিল, অর্থাৎ সেই ঘাড় মৃত্যুর সময় চিবুক বরাবর কেটে ফেলা হয় আর তার শেষ আক্ষেপটুকুও পূর্ণ হয় নি।

হযরত রুবাই বিনতে মুয়াওয়েয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমার চাচা হযরত মুআয বিন আফরা (রা.) আমাকে কিছু তাজা খেজুরসহ মহানবী (সা.)-এর খিদমতে প্রেরণ করেন।

তখন মহানবী (সা.) আমাকে কিছু অলঙ্কার প্রদান করেন যা তাঁকে (সা.) বাহরাইনের শাসক উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত রুবাই বিনতে মুয়াওয়েয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমার চাচা হযরত মুআয (রা.) আমার হাতে মহানবী (সা.)-এর সকাসে একটি উপহার প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি (সা.) তাকে কিছু অলঙ্কার উপহার দেন যা বাহরাইনের শাসকের পক্ষ থেকে তিনি (সা.) পেয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর লিখেন, ইসলামের বিস্তার লাভের পর মহানবী (সা.) বাদশাহগণের নামে পত্র লিখেছিলেন এবং তাদেরকে উপহার প্রেরণ করেছিলেন তখন বাহরাইনের শাসক এবং অন্যান্য বাদশাহরাও মহানবী (সা.)-এর সকাসে পত্র লেখেন এবং নানাবিধ উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন।

হযরত মুআয বিন হারেস (রা.) চার বিয়ে করেছিলেন যার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ- প্রথম স্ত্রী হলেন, হাবীবা বিনতে কায়েস, যার গর্ভে উবায়দুল্লাহ্ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী হলেন, উম্মে হারেস বিনতে সুবরা, যার গর্ভে হারেস, অওফ, সালমা, উম্মে আব্দুল্লাহ্ এবং রামলা জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় স্ত্রী হলেন, উম্মে আব্দুল্লাহ্ বিনতে নুমায়ের, যার গর্ভে ইব্রাহীম এবং আয়েশা জন্মগ্রহণ করেন। আর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন, উম্মে সাবিত রামলা বিনতে হারেস, যার গর্ভে সারা জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত মুআয (রা.)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে আসীর তার পুস্তক 'উসদুল গাবা'-তে বিভিন্ন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এক উক্তি অনুসারে, হযরত মুআয (রা.) বদরের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং মদীনায় ফিরে আসার পর সেই ক্ষতের কারণেই মৃত্যুবরণ করেন। আরেকটি ভাষ্য অনুযায়ী তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অপর এক উক্তি অনুসারে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন; হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত সিফফিনের যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। সিফফিনের যুদ্ধ ৩৬ ও ৩৭ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত মুআয সেই যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন। যাহোক, তার মৃত্যুর বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে; এমন কিছু বিবরণ রয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। সন্তান ও স্ত্রীদের বিষয়টিও যদি বিবেচনা করা হয় তবে তা থেকেও এটি-ই বোঝা যায়।

এই সাহাবীর স্মৃতিচারণের পর এখন আমি মোকাররম মুন্সী ফিরোয দীন সাহেবের পুত্র মোকাররম রানা নঈম উদ্দীন সাহেবের স্মৃতিচারণ করব, যিনি গত ১৯ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে পরলোকগমন করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন; বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে বেশ কয়েকবার হাসপাতালে গিয়েছিলেন আর প্রতিবারই ডাক্তার বলতেন, এটি তার অন্তিম সময়। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসতেন। যখনই সুস্থ হতেন আর চলাফেরা করতে পারতেন তখন এখানেও মসজিদে আসা-যাওয়া শুরু করে দিতেন। যাহোক, সর্বশেষ এই অসুস্থতা তার জন্য প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কাগজপত্র অনুযায়ী রানা সাহেবের জন্ম হয় ১৯৩৪ সালে, অপরাপর রেওয়ায়েত অনুসারে ১৯৩০ বা ৩২ সালে। নথিপত্র অনুযায়ী যেহেতু (জন্ম) ৩৪ সালে, সেই হিসেবে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল তার শ্রদ্ধেয় পিতা ফিরোয দীন সাহেবের মাধ্যমে, যিনি ১৯০৬ সালে পত্রযোগে হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে দেশ-বিভাগের পর অর্থাৎ যখন ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হয়ে যায়, তখন এই পরিবার পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে তারা লাহোরে ছিলেন, পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে রানা সাহেব রাবওয়ায় চলে আসেন। এরপর তিনি নিজেকে ফুরকান ব্যাটালিয়নের জন্য উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রানা সাহেবকে মিরপুর-খাসের কাছে অবস্থিত জমিজমার দেখাশুনার জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেন। তিনি অনেক আগেই ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন, ১৯৫১ সালে তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তার সহধর্মিনীর নাম ছিল সারাহ পারভীন, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী চৌধুরী দৌলত খান সাহেবের পৌত্রী ছিলেন। তার সম্পর্কে প্রাপ্ত দাপ্তরিক রেকর্ড অনুসারে অর্থাৎ নিরাপত্তা বিভাগের রেজিস্টার অনুযায়ী ৩ আগস্ট, ১৯৫৪ সালে 'রিজার্ভ অন ডিউটি' হিসেবে রানা নঈম উদ্দীন সাহেবের পদায়ন হয়। এরপর ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৫৯ সালের ১১ মে পর্যন্ত বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগে গার্ড হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তফসীর প্রণয়নের কাজে যখন নাখলা-জাবায় যেতেন এবং কয়েক মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। মরহুম তখন সেখানে নিরাপত্তা ও ডিজেল-চালিত জেনারেটরের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতেন; সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না। সেখানে আবাদকৃত এই ছোট্ট জায়গার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল।

ওসীয়্যত দপ্তরের রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৭৮ সালে তিনি বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত হন। এরপর তিনি সাহিওয়াল জেলার হড়প্পায় চলে যান ও পরবর্তীতে শাহিওয়াল মসজিদের খাদেম হিসেবে কাজ করেন। সেখানে থাকাকালীন ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে শাহিওয়ালের আহমদীয়া মসজিদে বিরুদ্ধবাদীরা আক্রমণ করে, যেখানে তিনি নিরাপত্তার দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন। সেখানে যখন আক্রমণ হয় এবং তিনি এর পাল্টা জবাব দেন, তখন রানা নঈম উদ্দীন সাহেবসহ মোট এগারোজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এভাবে ১৯৮৪ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রানা সাহেব আল্লাহ্‌র পথে বন্দিদশায় জীবন কাটানোর সৌভাগ্য লাভ করেন।

পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পরিবর্তে আমাদের জামাতের এগারোজন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং তাদের শাস্তি হয়। এই মামলাটি মিলিটারী কোর্টে রেফার করে দেয়া হয় যা জিয়াউল হকের যুগে বিশেষ আদালত ছিল। সেখানে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে নিয়মিত শুনানী আরম্ভ হয় এবং ০১ জুন ১৯৮৫ তারিখ পর্যন্ত এ শুনানী চলতে থাকে। শুরুতে এই মামলায় এগারো জন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু পরে সাত জনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়। তাদের মাঝে রানা নঈম উদ্দীন সাহেবও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দু'জন বিদেশ চলে গিয়েছিলেন আর দু'জনকে নির্দোষ খালাস দেয়া হয়েছিল। এই সাত জনের মামলা স্থগিত ছিল। পরে সেই বিশেষ মিলিটারী কোর্ট মুরব্বী সিলসিলাহ্ ইলিয়াস মুনির সাহেব এবং রানা নাঈম উদ্দীন সাহেবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। অভিযুক্ত বাকি পাঁচজনের প্রত্যেককে পঁচিশ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। যাহোক, কোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার পর লাহোর হাইকোর্ট ১৯৯৪ সনের মার্চ মাসে তাদের মুক্তির আদেশ দেয় এবং কাগজপত্রের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর ১৯ মার্চ ১৯৯৪ সনে তারা মুক্তি লাভ করেন। এভাবে আমাদের কারাবন্দিগণ সাড়ে নয় বছর আল্লাহ্‌র পথে বন্দিদশায় জীবন কাটানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এই বন্দিদের মুক্তিসংক্রান্ত হাইকোর্টের

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়। ২০১৩ সনের মে মাস থেকে সেটির শুনানী আরম্ভ হয়। এ দু'জন দেশের বাইরে থাকার কারণে উক্ত মামলার কোন অগ্রগতি হয় নি। এখন পর্যন্ত এই মামলা স্থগিত আছে। বন্দি অবস্থায় পুলিশের পক্ষ থেকে অত্যধিক দৈহিক নির্যাতন করা হয় এবং বলপূর্বক তার কাছ থেকে এ মর্মে বয়ান আদায়ের চেষ্টা করা হতো যে, তুমি যেহেতু তোমাদের খলীফার বডিগার্ড ছিলে তাই তিনি তোমাকে মুসলমানদেরকে এভাবে মারার জন্য পাঠিয়েছে। রানা নঈম উদ্দীন সাহেব এই মামলা হতে নির্দোষ খালাস পাবার পর ১৯৯৪ ইং সনে লন্ডন স্থানান্তরিত হন আর এখানেও নিজ বয়সের নিরিখে সাধ্যাতীতভাবে নিরাপত্তা কর্মী হিসাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সনে তার বড় মেয়ে মারা যায় এবং এর কিছুদিন পরই তার স্ত্রীও প্রয়াত হন। এরপর তিনি আমার কাছে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি চান; পরিস্থিতি বাহ্যত কঠিন ছিল, যাহোক আমি তাকে বললাম, গিয়ে দ্রুত ফিরে আসুন। তিনি কয়েকদিনের জন্য যান, এরপর ফিরে আসেন।

মরহুম তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারে এক পুত্র এবং চার কন্যা রেখে গেছেন। তার পুত্র ওয়াকেফে জিন্দেগী রানা ওয়াসিম আহমদ সাহেব যুক্তরাজ্যে প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরে কাজ করছেন, আর চার কন্যাও লন্ডনেই বসবাস করছে। তার পুত্র লিখেন, আমাদের পিতা আমাদেরকে সর্বদা এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে; সবকিছু খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। নিজেও খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন আর বলতেন, আমি ডিউটি দিতে গিয়ে যখন যুগ-খলীফাকে দেখি তখন যুবক হয়ে যাই। আমি যে এ বয়সেও ডিউটিতে আসি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী– এর পেছনেও রহস্যও এটাই; অন্যথায় আমি তো খাটে পড়ে থাকতাম। তিনি সময়ানুবর্তী ছিলেন; সর্বদা ডিউটির জন্য দুই তিন ঘন্টা পূর্বেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতেন। আমি যদি বলতাম, আব্বু! এখনও অনেক সময় বাকি; তখন তিনি বলতেন, তাতে কী হয়েছে, ঘরে বসে কী করব? হিশাম নামের একজন ডাক্তার লিখেন, আমি তার নথিপত্র দেখেছি, তার ফাইল দেখেছি ও পড়েছি; আমি বিস্মিত হয়েছি যে, এ রোগে এ বয়সে মানুষ তো ঘরে বসে যায় অথবা কেয়ারহোমে চলে যায়, কিন্তু তিনি দিব্যি চলাফেরা করছেন। আর তিনি এই কথাই বলতেন যে, আমার এখানে আসা, যুগ খলীফার সাথে থাকা এবং তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করাই আমার সুস্বাস্থ্যের বা চলাফেরার আসল রহস্য। তার পুত্র রানা সাহেব লিখেন, আমি প্রায়ই তাকে মালিশ করতাম; একদিন তার পা মালিশ করছিলাম, মালিশ করতে করতে তার হাঁটুর কাছে পৌঁছলে তিনি সামান্য আওয়াজ করেন। আমি জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে? তিনি বললেন, কিছু না। যাহোক, আমি পীড়াপীড়ি শুরু করলে তিনি বলেন, এগুলো কারাগারের প্রহারের ব্যাথা। সর্বদা ধৈর্য ও সংযমের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। কারাগারে যখন অত্যাচার করা হয় তখন অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মারা হয়ে থাকে, বিশেষ করে পাকিস্তানী জেলে। যাহোক, সেখানে তিনি সবকিছু সহ্য করেছেন আর বাহিরে এসেও তার ধৈর্যের মান ছিল অনেক উঁচু। কখনো শরীর খারাপ হলে কাউকে কিছু বলতেন না বরং অধিকাংশ সময় এটাই বলতেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্, আমি ভালো আছি।

খিলাফতের প্রতি তার আনুগত্যের মান কেমন ছিল– এ বিষয়ে তিনি বলেন, প্রায়সময় বিভিন্ন ঘটনা শোনাতে বলতাম, একবার আমি আমার পিতার কাছে বসেছিলাম, তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন নাখলা-জাবায় গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তফসীর লিখছিলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম, আমি যেমনটি ইতিপূর্বে বলেছি যে, তিনি

সেখানে ছিলেন। তিনি বলেন, তখন কোন কারণে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন [অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) রানা নঈম উদ্দিন সাহেবের প্রতি অসন্তুষ্ট হন] আর আমাকে বলেন, তুমি মসজিদে চলে যাও, সেখানে গিয়ে ইস্তেগফার কর। তিনি বলেন, আমি মসজিদে চলে যাই। জাবায় ছোট্ট একটি কাঁচা মসজিদ ও কাঁচা আঙিনা ছিল। আমি মসজিদের আঙিনায় বসে ইস্তেগফার করতে থাকি। পরক্ষণেই প্রবল ঝড় আসে ও বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, কিন্তু আমি আমার জায়গাতেই বসে ইস্তেগফার করছিলাম, যখন অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যায় আর মসজিদের যে ছাউনি ছিল তা-ও উড়ে যায়, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, নঈম কোথায় গেছে? কয়েকজন আমার খোঁজে মসজিদে আসে আর বলে যে, হুযূর (রা.) তোমাকে ডাকছেন। আমি যখন হুযূরের অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি জানতাম যে, তুমি সেখানেই বসে থাকবে। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

পুনরায় তার পুত্র পিতার বরাতে লিখেন যে, যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তফসীর লিখা আরম্ভ করেন তখন আমার পিতা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর খিদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি এর উল্লেখ করতেন এবং আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন। তার স্বভাব ছিল, তিনি তার আনন্দের কথা সবার সাথে ভাগাভাগি করতেন কিন্তু তার দুঃখ-কষ্ট কখনো কাউকে বলতেন না।

মরহুমের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেন, তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা ও প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। রানা ওয়াসিম জীবন উৎসর্গ করেছেন। ওয়াকফ গৃহীত হওয়ার পর একদিন তিনি ওয়াসিমকে বলেন, এটি অনেক বড় দায়িত্ব, সর্বদা তওবা-ইস্তেগফারে রত থেকে ওয়াকফ এর দায়িত্ব পালন করবে। কেউ কখনো কোন কষ্ট দিলেও চুপ থাকবে, কোন ধরনের তর্কে জড়াবে না। সব বিষয় আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিবে, ধৈর্য ধারণ করবে, কখনোই ধৈর্যহারা হবে না, আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। তিনি পরম বন্ধুর ন্যায় আমাকে উপদেশ দিতেন। তারপর বলেন, আমার স্ত্রী তথা তার পুত্রবধূর সাথেও বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন, বরং নিজ মেয়েদের চেয়েও উত্তম ব্যবহার করতেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে আরো একটি কথা বলেছেন যে, রাবওয়ায় হযরত আম্মাজানের দ্বাররক্ষী হওয়ার সম্মানও তিনি লাভ করেছেন। তিনি নিজে ওসীয়ত করার পর তার অন্যান্য আত্মীয়দেরও ওসীয়ত করার করার জন্য নসীহত করতেন। চাঁদার বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে চাঁদা আদায় করতেন আর এরপর অন্যান্য খরচ করতেন। তিনি সর্বদা গোপনে অনেক লোককে আর্থিক সহযোগিতা করতেন আর কখনো কারো কাছে এর উল্লেখ করতেন না। তার মেয়েরা লিখেছে যে, খিলাফতের সাথে বাবার ঈর্ষণীয় সম্পর্ক ছিল। তার শিরা উপশিরায় খিলাফতের ভালোবাসা ছিল। যখনই যুগ খলীফার কথা হতো, তার চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে যেত। কর্মকর্তাদের প্রতি সম্মানের একটি ঘটনা তার মেয়ে লিখেছেন যে, একবার আমরা সব বোনেরা মুলাকাতের উদ্দেশ্যে বাবার সাথে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরে বসেছিলাম এবং ভেতরে গিয়ে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ আমরা দেখি যে, বাবা এলার্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যান যেভাবে ডিউটিরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা অবাক হয়ে যাই যে, হঠাৎ কী হলো? তখন সামান্য মাথা উঠিয়ে তাকালে দেখতে পাই যে, নিরাপত্তা বিভাগের নায়েব অফিসার কোন কাজে দপ্তরে এসেছিলেন অথবা ডিউটির জন্য এসেছিলেন। তার সম্মানার্থে আমার বাবা দাঁড়িয়ে যান এবং যতক্ষণ তিনি সেখানে ছিলেন বাবাও দাঁড়িয়ে

থাকেন। যখন তিনি বাহিরে চলে যান তখন আমার বাবা বসে পড়েন। তিনি বলেন, এটি মাত্র কয়েক মিনিটের বিষয় ছিল, কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়ে গিয়েছে। আমাদেরকে সারাজীবন তিনি এই নসীহত-ই করেছেন যে, জীবনকে সার্থক করতে চাইলে খিলাফতের সাথে এমনভাবে আঁকড়ে থাক যেভাবে লোহা চুম্বকের সাথে জুড়ে থাকে। এরপর তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্বে আমাদের চার বোন, ভাই ও ভাবীকে বাবা যখন ঈদী দেন তখন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, বাবা! এখনও তো রমজান মাসই আরম্ভ হয় নি; উত্তরে তিনি বলেন, জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা উচিত নয়। অর্থাৎ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজ সন্তানদেরকে তিনি ঈদীও দিয়ে গিয়েছেন।

তার পুত্রবধূ বর্ণনা করেন যে, আমার প্রতি অনেক খেয়াল রাখতেন। সর্বদা পিতার মতো আমাকে নসীহত করতেন। যখন তার পুত্রবধূর পিতা মৃত্যুবরণ করেন তখনই নিজ পুত্রকে বলেন যে, তোমরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী পাকিস্তান যাও এবং সেখানে তার জানাযায় অংশগ্রহণ কর। এরপর এই পুত্রবধু লিখেন যে, যখনই রাতের কোন প্রহরে আমার চোখ খুলেছে আমি সর্বদাই তাকে নামায পড়তে দেখেছি। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। যারা চিঠি লিখেছে তাদের প্রায় সবাই এটি লিখেছে যে, খিলাফতের সাথে তার গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তিনি বলতেন, খিলাফতের দোয়ার বদৌলতেই কারাগারে অবস্থান করেছি এবং খিলাফতের দোয়ার বরকতেই এখানে আছি। তিনি আরো বলতেন, যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মৃত্যুপরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছিল, খিলাফতের দোয়ার কল্যাণে তার তো কোন অস্তিত্ব নেই যে, সে কোথায় গিয়েছে আর রানা সাহেব জীবন্ত নিদর্শনস্বরূপ জগতের সামনে উপস্থিত আছেন।

তাঁর এক মেয়ে আবেদা বলেন, আমাদের সন্তানদের তিনি সর্বদা একটি উপদেশ দিতেন যে, খোদা তা'লা এবং খিলাফতের সাথে সবসময় দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখবে; এতেই তোমাদের স্থায়ী জীবন নিহিত। তিনি সর্বদা কুরআন মজীদ পাঠ করার প্রতি জোর দিতেন; নিয়মিত নামায এবং তাহাজ্জুদ পড়তেন। তিনি বলেন, আমি জীবনে তাকে কখনো তাহাজ্জুদ নামায ছাড়তে দেখি নি। তিনি আমাদের জন্য দোয়ার এক ভাণ্ডার ছিলেন; ভীষণ অতিথিপরায়ণ ছিলেন; দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের খেয়াল রাখতেন। তিনি নিজ পিতামাতা ও মরহুমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাদের পক্ষ থেকেও নিয়মিত চাঁদা দিতেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সবসময় একটি পঙক্তি উঁচুস্বরে পাঠ করতে শুনেছি। সেটি হলো,

"হো ফযল তেরা ইয়া রাব্ব ইয়া কোঈ ইবতিলা হো
রাযী হ্যা হাম উসী মে জিস মে তেরী রেযা হো"

অর্থাৎ, "হে প্রভু! অনুগ্রহ বা পরীক্ষা যা-ই হোক
তোমার সন্তুষ্টিতেই আমি সন্তুষ্ট"।

তার মেয়ে বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর আমাদের সব বোনের প্রতি খুবই খেয়াল রেখেছেন আর পুত্রবধূকে মেয়েদের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন। বাইরে থেকে যা-ই নিয়ে আসতেন অথবা ঈদী দেয়ার সময় পুত্রবধূকে প্রথমে দিতেন, এরপর আমাদের সবাইকে দিতেন। তিনি সর্বদা বলতেন, একজনের মেয়েকে ঘরে এনেছি, তার প্রতি বেশি যত্ন নিতে হবে, কেননা খোদা তা'লার কাছে আমাকে জবাব দিতে হবে।

আরেক মেয়ে লিখেন, সত্যিই পরীক্ষার যে দিনগুলো তিনি কারাগারে অতিবাহিত করেছেন তা তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, ধর্মানুরাগ এবং খিলাফতের ভালোবাসায় কাটিয়েছেন।

তার মুখ থেকে কোন অভিযোগ তো দূরের কথা, উফ্ শব্দও শুনি নি। ফরয নামায ও তাহাজ্জুদ নামায পড়তে কখনো বিলম্ব করেন নি। আর অসুস্থতার সময়ও নামায পরিত্যাগ করেন নি। কারাগারে নির্যাতনের কারণে তার কিডনির সমস্যা দেখা দিয়েছিল, আর শেষ দিকে এসে তা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এর সাথে শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য শারিরীক সমস্যাও ছিল। তিনি লিখেন, আমরা কখনোই তার পক্ষ থেকে অস্থিরতার কোন বহিঃপ্রকাশ দেখি নি। সর্বদাই তাকে শুধু আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতায় আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে শুনেছি।

তার আরেক মেয়ে লিখেন, আমাদের ব্যাপারে এতদূর চিন্তা করে রেখেছিলেন যে, তিনি বলতেন, আমার প্রায় ৮৭/৮৮ বছর বয়স হয়েছে। বলা যায় না কখন কী হয়। আমি যখন থাকব না, অর্থাৎ আমি মারা গেলে, আমার দেহ পাকিস্তানে নিয়ে যেও। সেইসাথে মেয়েদের এটাও বলেন যে, তোমাদের পাকিস্তান যাবার টিকিটের টাকা আমি আলাদা করে রেখেছি, আমার জানাযা নিয়ে যাবার সময় যেন স্বামীর দিতে তাকিয়ে থাকতে না হয়। নিজের বাবার জানাযাতে নিজের বাবার টাকায় যাবে। এখন তো বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তার মৃতদেহ সেখানে নেয়া সম্ভব নয়। এখানে সাময়িকভাবে আমানত হিসেবে দাফন করা হয়েছে। পরে যখন সুযোগ ও সুবিধা হবে তার ইচ্ছা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ্ তার মরদেহ সেখানে পাঠানোর চেষ্টা করা হবে। রাবওয়ার তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ তার ভাগ্নে রানা সাব্বির সাহেব কাজ করেন। তিনি লিখেন, তিনি যখন কারাবাসে ছিলেন তখন তার সাথে আমার বেশ কয়েকবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। যখনই কারাগারে তার কাছে কোন জিনিস পৌঁছানোর জন্য যেতাম তখন অনেক দুশ্চিন্তা হতো, কিন্তু তিনি প্রায়ই আমাকে ধৈর্য ও দোয়া করার জন্য বলতেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চমার্গের বুযুর্গ ও ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন।

একইভাবে তার স্ত্রীর ভাতিজি রুবিনা সাহেবা লিখেন, তিনি ১৯৮০ সন পর্যন্ত কাসরে খিলাফতে ছিলেন। আমরা যখন জলসায় যেতাম আর কখনো কখনো দু'একটি অ-আহমদী পরিবারও সাথে থাকত অর্থাৎ জলসায় আত্মীয়স্বজন ও মেহমানরা যোগ দিত, তখন আমার ফুফা তার স্ত্রীকে বলতেন, মেহমানদের খেয়াল রাখতে হবে। খাবার-দাবার ও শোবার ব্যবস্থায় তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। জায়গার সংকুলান না হলে নিজে সন্তানদের নিয়ে তিনি স্টোর বা রান্নাঘরে ঘুমিয়ে পড়তেন আর অতিথিদের শোবার ঘর ও বারান্দাসহ ভালো জায়গায় ঘুমাতে দিতেন। তিনি বলতেন, তারা মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মেহমান। তাদের কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

তার এক ভাগ্নে বলেন, আমি তার সাথে কারাগারে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। যখন তাকে খবরাখবর জিজ্ঞেস করি এবং ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাই তখন অত্যন্ত উদ্দীপ্ত-উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, ভাগ্নে! সর্বদা কলেমার সুরক্ষা করতে হবে। যদি তোমার প্রাণও চলে যায় তাতে কোন পরোয়া নেই। এই ভাগ্নে আরো বলেন, তখন আমার এমন মনে হয় যেন এ কথাগুলো কোন মানুষের নয় বরং ফেরেশতার আওয়াজ ছিল। তিনি অত্যন্ত সাহসী, বীর, কলেমার সুরক্ষাকারী এবং খিলাফতের প্রেমিক নির্ভিক এক আহমদী মুসলমান ছিলেন।

এরপর তিনি বলেন, বেলজিয়াম থেকে যখন লন্ডন স্থানান্তরিত হয়েছিলাম তখন তিনি বলেন, যেহেতু খিলাফতের কারণে এসেছ তাই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। যুগ খলীফার প্রতিটি কথায় লাব্বায়েক বলবে, নতুবা কোন লাভ নেই। এরপর এটিও বলেছেন যে, নিয়মিত নামায আদায় করবে এবং কোন বিষয়ে বিচলিত না হয়ে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সকাশে অবনত হবে। মিথ্যাবাদী ও কপটাচারীর প্রতি খুবই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। নিজ ডিউটি

সম্পর্কে অনেক চিন্তিত থাকতেন। কখনো স্বাস্থ্য বেশি খারাপ হলে ঘরের সদস্যরা বলত, আজকে বিশ্রাম নিন। তিনি বলতেন যে, না, আমি সুস্থ আছি। এগুলো আমার বোনাসের দিন। বৃদ্ধ বয়সে খিদমতের সুযোগ পাচ্ছি, তাই কাজে লাগাতে দাও।

জেলখানায় রানা সাহেবের সঙ্গী ইলিয়াস মুনীর সাহেব লিখেন, রানা সাহেবের সাথে আমার জীবনের একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে। আর এখন শেষ বিদায়ের সময় তাকে দেখতে পারছি না, তাই মন চরম অস্থির ও বিচলিত হয়ে আছে। রানা সাহেবের সাথে ১০ বছর জেলখানায় অতিবাহিত হয়েছে। একদিনও আমি তাকে মনোবল হারাতে দেখি নি। এমনকি যখন সামরিক শাসকের পক্ষ থেকে তাকে অন্যায় ও পাশবিক মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনানো হয় তখনও তিনি তা হাসি মুখে শুনেছেন এবং মেনে নিয়েছেন। তার পরিবার বেশ বড় ছিল এবং সব সন্তানই অল্পবয়স্ক ছিল। জীবনোপকরণেরও বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ছিল, ধর্মসেবার প্রেরণা ছিল আর জামা'তের সম্মানের চিন্তা ছিল। কখনো উৎকণ্ঠিত হলে শুধু এতটুকু বলতেন যে, এদের ষড়যন্ত্র খুবই ভয়ানক, আল্লাহ্ তা'লাই আছেন যিনি এদের হাত থেকে নিরাপদ রাখবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লাই তার সবকাজ সমাধা করেছেন, বন্দি থাকাকালেই তার মেয়েদের বিয়েও হয়ে যায়।

ঘটনার উল্লেখ করে ইলিয়াস মুনীর সাহেব সংক্ষেপে লিখেন যে, দাঙ্গাবাজরা যখন মসজিদের ওপর আক্রমণ করে আর 'পবিত্র কলেমা' এবং (কুরআনের) আয়াত ও হাদীসের অসম্মান করতে আরম্ভ করে সেই দৃশ্য আমি ভুলতে পারি না। তখন তাকে প্রথমবার বজ্রকণ্ঠে ধমক দিতে শুনেছিলাম, অর্থাৎ রানা সাহেব বলেছিলেন, তোমরা কলেমা মুছে ফেলার কে? তিনি বলেন, এর পূর্বে আমি তাকে (অর্থাৎ রানা সাহেবকে) কখনো উর্দূ বলতে শুনি নি, কিন্তু সে সময় তিনি উর্দূতে কথা বলেন এবং বজ্রকণ্ঠে বলেন। আর একাই ত্রিশ-চল্লিশজন আক্রমণকারীকে প্রথমে মসজিদের কোণায় লুকাতে এবং এরপর পালাতে বাধ্য করেন। এরপর লিখেন, তিনি পরম বীরত্বের সাথে কেবল এ কাজই করেন নি বরং পুলিশ অফিসার যখন জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, গুলি কে ছুড়েছিল, তখন তিনি এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেন, আমি করেছি। এরপর তার ওপর বিভিন্ন কায়দায় নির্যাতন চালানো হয় এবং এ মর্মে জামা'তের কর্মকর্তাদের নাম নিতে বাধ্য করার অপচেষ্টা করা হয় যে, তাদের কথায় এ কাজ করেছি। কিন্তু বাহবা সেই বীর পুরুষের, জন্য যিনি জামা'তের ব্যবস্থাপনার ওপর তিল পরিমাণও আঁচ আসতে দেন নি আর বাস্তবতাও তা-ই ছিল; জামা'তের কর্মকর্তাদের এটি জানা ছিল না যে, তার কাছে তার ব্যক্তিগত বন্দুক রয়েছে। এছাড়া আদালত, তাও আবার বিশেষ সামরিক আদালতের কোন চাপের সামনে নতি স্বীকার করেন নি। মৌখিক এবং লিখিতভাবে স্বচ্ছ বিবেক নিয়ে স্পষ্টভাষায় বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে এ কথা স্বীকার করেন যে, তিনি নিজেই গুলি ছুঁড়েছিলেন আর তার এই বীরত্ব, সাহসিকতা, স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এবং জামা'তের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার প্রেরণার কারণেই অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাকে সফলকাম করেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি খিলাফতের সাথে থেকে সেবা করারও তৌফিক লাভ করেন।

এরপর ইলিয়াস মুনীর সাহেব আরো লিখেন, বন্দি থাকাকালে তার পিতার কাছে যখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র লিখিত খুতবা আসতো আর তিনি তা আমাদের জন্য নিয়ে আসতেন তখন রানা সাহেব আমাকে খুতবা পড়ে শোনানোর জন্য তার সাথে বসাতেন আর যতদিন আমরা মৃত্যুদণ্ডের কালকুঠুরিতে ছিলাম, তাদেরকে পৃথক পৃথক সেলে রাখা

হতো। তিনি বলেন, আমাদেরকে যখনই কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে দেয়া হতো, উভয়কে একত্রিত করার জন্য সেল খোলা হতো, তখন সেই সময়টুকু শুধুমাত্র খুতবা শোনার জন্য উৎসর্গ করতেন আর যত্ন সহকারে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে খুতবা শুনতেন।

এরপর বলেন, যেসব নামায বাজামাত পড়া সম্ভব হতো তা পুরো প্রস্তুতি ও সচেতনতার সাথে পড়তেন। বরং অনেক সময় জেলে থাকা অন্যান্য আহমদীদেরও ডেকে আনতেন। রমজানের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তিনি বলেন, মে, জুন ও জুলাই মাসের কঠিন সময়ের রোযা আমাদের জেলে থাকাকালে এসেছিল আর মোহতরম রানা সাহেব নিজের বৃদ্ধ বয়স এবং জেলখানার বিভিন্ন কাঠিন্য সত্ত্বেও সব রোযা রাখতেন। ইলিয়াস মুনীর সাহেব বলেন, খুবই অসাধারণ সাহস ও মনোবল তিনি প্রদর্শন করেছেন আর সানন্দে সকল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। এমনকি তাকে যখন মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনানো হয় তখনও তিনি পরম সাহসিকতার সাথে সময় পার করেছেন আর তার বীরত্ব এমন ছিল যে, অআহমদীরাও তা অনুভব করেছে। তিনি বলেন, দেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাবার পর জেলের একজন ওয়ার্ডেন রানা নাঈম উদ্দীন সাহেবের কাছে আসে এবং বলে, বুজুর্গ! দেখুন, এই মির্যাঈরা (অর্থাৎ আহমদীরা) বড়ই অদ্ভুত মানুষ। তারা মৃত্যুদণ্ডের তারিখ-ক্ষণ অবগত হয়েছে এবং নিজেদের অন্তিম পরিণতির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, কিন্তু তাদের চেহারায় কোন ছাপ নেই, এতটুকু তারতম্য ঘটে নি আর সামান্য পরিমাণও ভেঙে পড়ে নি। যাহোক সে কথা দীর্ঘ করতে থাকে। রানা সাহেব বলেন, আমি বুঝতে পারি যে, সে জানে না আমি কে? অতএব সে যখন তার কথা শেষ করে তখন রানা সাহেব জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি আমার চেহারায় কোন ছাপ দেখতে পেয়েছ কি? সে উত্তর দেয় যে, না। তখন রানা সাহেবের এই কথায় সে কেঁপে উঠে যে, আমিও আহমদী এবং তাদেরই একজন।

পরিশেষে একটি পত্র পাঠ করছি যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রানা নঈম উদ্দীন সাহেবকে লিখেছিলেন। সেই পত্রের একটি অংশ হলো, আপনার নিষ্ঠাপূর্ণ পত্রাবলী পেয়েছি। উন্নত ঈমানের সুদৃঢ় যে পাহাড়ে আপনি দণ্ডায়মান রয়েছেন তা গর্বের বিষয়। আল্লাহ্ ওয়ালাদের উন্নত মান অর্জন করার পূর্বে এরূপ কঠিন পথ পাড়ি দিতেই হয়। আপনাদের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা হয়। বৃক্ষের পরিচয় ফলে। আপনারাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৃক্ষের সবুজ-সতেজ শাখা এবং সুমিষ্ট ফল। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের বিনষ্ট করবেন না। জামা'ত দোয়া করে যাচ্ছে। আমার দোয়াও আপনাদের সাথে রয়েছে। আশা করি আপনি আমার সাম্প্রতিক নযমও শুনে থাকবেন, তাতে আপনি ও আপনার মতো নিষ্ঠাবানদের জন্যই আন্তরিক বাণী ও সালাম রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা নিজ ফিরিশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করুন এবং শত্রুদের থাবা থেকে মুক্তি দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনার সাথী হোন– এই চিঠি হযরত খলীফা রাবে (রাহে.) রানা সাহেবকে লিখেছিলেন।

মুবারক সিদ্দীকি সাহেব বলেন, একবার আমি তার কাছে তার বন্দি জীবনের কথা জিজ্ঞেস করি আর জেলখানার কষ্টের কথা জানতে চাইলে তিনি মুচকি হেসে বলেন, আমাদের তথা আহমদীদের জীবন আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে, রসূলের খাতিরে এবং যুগ-খলীফার আনুগত্যের জন্য নিবেদিত। তাই আমার কাছে কখনো কোন কষ্টকে কষ্ট মনে হয় না। আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। নিশ্চিতভাবে তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। আমিও যখনই তাঁর খবরাখবর জিজ্ঞেস করতাম

তিনি আলহামদুলিল্লাহ্-ই বলতেন। হাসপাতাল থেকে ফিরে পরের দিনই চলে আসতেন আর বলতেন আমি পুরোপুরি সুস্থ; বরং একইসাথে আমাকেও দোয়া দিতেন।

যেমনটি আমি বলেছি, এক ডাক্তার বলেন, এ রোগে আক্রান্ত রোগী, যাদের পা-ও ফোলা থাকে, তারা ঘরের বাহিরে যেতে পারে না কিন্তু তিনি এসে ডিউটিতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর এতে ডাক্তাররা বড়ই আশ্চর্য হতো। ডাক্তাররা হয়ত আশ্চর্য হতো, কিন্তু তাদের জানা নেই যে, তার মাঝে এক সুগভীর প্রেরণা ছিল, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ছিল, খেলাফতের সান্নিধ্যে থাকার ব্যাকুলতা ছিল, যা তাকে মসজিদে টেনে আনতো আর ডিউটিতে নিয়ে আসতো। আমি তার চেহারায় সর্বদা পরম প্রশান্তি লক্ষ্য করেছি এবং খিলাফতের জন্য ভালোবাসা দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে পরকালে স্নেহ ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং নিজ প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন।

আমি তাকে শৈশব থেকে চিনি। যেমনটি বলা হয়েছে, তিনি যখন নাখলা-জাবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে ছিলেন, তখন তিনি সাথে যেতেন, আমরাও গ্রীষ্মকালে কিছু দিনের জন্য সেখানে যেতাম। তখনও আমাদের সাথে তার অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ছিল। আর খলীফা হওয়ার পর আমার সাথে এতে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। যেমনটি খিলাফতের প্রতি তার বিশ্বস্ততার ঘটনাবলী এবং নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ-অনুভূতির কথা আমরা শুনলাম, তা সর্বদা তার মাঝে পরিলক্ষিত হতো। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও সর্বদা নিষ্ঠার সাথে নিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন। পরিস্থিতির কারণে তার জানাযা পড়া সম্ভব হয় নি, আমি পড়তে পারি নি। সরকারী বিধিনিষেধও ছিল, এছাড়া আরো কিছু নিষেধাজ্ঞাও ছিল। আমাদের এই আক্ষেপও আছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তী কোন সময় আমি তার গায়েবানা জানাযাও পড়াব।

সবশেষে আমি পুনরায় বর্তমান মহামারির প্রেক্ষিতে এটিও বলতে চাই যে, আমাদের কতিপয় আহমদী রোগী রয়েছেন। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করুন। আর আমাদেরকেও নিজ সন্তুষ্টির পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত করার এবং হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার প্রদানের তৌফিক দান করুন আর অচিরেই আমাদের মাঝ থেকে এই বিপদ দূর করুন। আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকেও কাণ্ডজ্ঞান দান করুন, তারাও যেন এক খোদাকে চিনতে পারে, খোদা তা'লার ইবাদতকারী হয়, তৌহীদকে বুঝতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি কৃপা করুন। (আমিন)